ভাষার অধিকারের জন্য সংগ্রামের তাৎপর্য

সোহিনী সাহা

"আমাদের জাতীয় ভাষা কি?"

কি বলবেন, 'হিন্দি'?

না, এটা আমাদের জাতীয় ভাষা নয়; আসলে আমাদের জাতি রাষ্ট্রের কোন 'জাতীয় ভাষা' নেই, যা আছে তা হল দুটি 'অফিসিয়াল ভাষা'।

১. হিন্দি. ২. ইংরাজী।

প্রথমত, **ভাষা কি?** মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যম। এখন, **অফিসিয়াল ভাষা কি?** তা হল রাষ্ট্রের মতামত আদান-প্রদান অর্থাৎ শাসন চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

আমরা ঠিক কি বোঝাতে চাই যখন আমরা বলি রাষ্ট্রের শাসন? এটা কি শুধুই একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, না অন্য কিছু? আসলে, রাষ্ট্রের উদ্ভবই শ্রেণীশাসনের হাতিয়ার হিসাবে, এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার, যেভাবে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্ ব্যাখ্যা করেছেন; এবং তা কোন ভাবেই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য জন্ম নেয়নি, যে ভুল ব্যাখ্যা প্রায়শঃই করা হয়ে থাকে। এটা সেই শৃঙ্খলা তৈরি করা, যা শাসকশ্রেণীর নিপীড়ণকে বৈধ ও দীর্ঘমেয়াদী করে তোলে। রাষ্ট্র তাই নিপীড়িত-শ্রেণীগুলিকে শোষণের অস্ত্র বা যন্ত্র এবং সেজন্যই একটি রাষ্ট্রের অফিসিয়াল ভাষা, আর কিছুই নয়, কেবল নিপীড়নের মাধ্যম।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টিই হয়েছিল তখন, যখন শ্রেণীদ্বন্দ্বের অন্য কোনভাবে সমাধান সম্ভব ছিল না। ভাষার উদ্ভব হয়েছিল তখন, যখন মানুষ দেখেছিল মতামতের আদান-প্রদান ব্যাতিরেকে একসাথে কাজ করা অসম্ভব। মানুষ নিজেই সৃষ্টি হয়েছিল তার পূর্বতন প্রজাতির থেকে, শ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রমে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে, এবং এভাবে এগোনোর পথে এই উৎপাদনশীল শ্রমই মানুষকে শিখিয়েছিল একসাথে কাজ করতে। যখন সে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য একসাথে কাজ করার উপযোগিতা বুঝল, মতামতের আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, এবং সে তার বিবর্তন ঘটাল, আকার-ইঙ্গিত-আওয়াজের বদলে আরও অর্থবহ শব্দের প্রয়োগে, যা হয়ে উঠল তার স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে মতামত আদান-প্রদানের উপায়।

মানুষ, তার নিজের প্রয়োজনে, শব্দকে করে তুলেছিল অর্থবহ যা আত্মপ্রকাশ করেছিল ভাষা হিসাবে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি সে পরিবর্তিত করে তার বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এবং এভাবেই আসে বিভিন্ন প্রকার ভাষা ও তাদের উচ্চারণের বিভিন্ন ধরন। শ্রম যত এগিয়ে চলে, ততই ভাষাও, আর এই বৈশিষ্ট্যই এগিয়ে চলার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, যখন মানুষ গড়তে থাকে তার **সামাজিক সংগঠন—সমাজ**, এবং যখন শ্রেণী দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যখন সমাজ হয়ে ওঠে তার **রাজনৈতিক সংগঠন—রাষ্ট্র**।

সাধারণতঃ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় সবচেয়ে শক্তিশালী, অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীর দ্বারা, যা আবার রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রধান রাজনৈতিক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং তাই নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে দমন ও শোষণের নিত্যনতুন উপায় বের করে। সেজন্যই, জাতিরাষ্ট্রগুলি হল শাসক শ্রেণীর যন্ত্র এবং আজ অবধি, শাসক শ্রেণীর ভাষাই হয়ে এসেছে জাতিরাষ্ট্রগুলির **'প্রকৃত'** বা **'তথা-কথিত'** জাতীয় ভাষা। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মানুষই (এমনকি আমাদের অধিকাংশও) হিন্দিকেই জাতীয় ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। আমাদের এটা বোঝা উচিৎ যে, এটা আর কিছুই নয় কেবল ভারতের শাসকশ্রেণীর ভাষা, যেমন 'ইংরাজী' হয়ে থেকেছে বিশ্বব্যাপী শাসক শ্রেণীর ভাষা। ভারতবর্ষের সংবিধান বলছে যে 'ভারতের প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসিয়াল ভাষা আদর্শ হিন্দি, যেখানে ইংরাজী দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষা। ভারতের সংবিধানের ৩৪৩(১) ধারা অনুযায়ী "ইউনিয়নের অফিসিয়াল ভাষা দেবনগরী অক্ষরে হিন্দি (উল্লেখ্য যে ৪১% দেশবাসী আদর্শ হিন্দি বা অন্যান্য আঞ্চলিক হিন্দিতে কথা বলেন; বন্ধনীর বক্তব্য আমার) এবং ইংরাজী"।" না ভারতের সংবিধান, না ভারতীয় আইন, কোথাও জাতীয় ভাষার উল্লেখ নেই, যা একটি হাইকোর্টের রায়েও সমর্থিত। কিন্তু, ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে সারণীতে থাকা ভাষাগুলি কখনও কখনও, আইন-কানুন ছাড়াই, উল্লেখ করা হয় জাতীয় ভাষা হিসাবে, অফিসিয়াল ভাষার বদলে।

তা সে যাই হোক, প্রশ্ন হল **'বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল ভাষার অর্থ কি?'** ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এর মানে হল সেই ভাষা, যা রাষ্ট্রের কেবল একটি অংশের, তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জনগণের বেশিরভাগেরই হোক বা এমনকি মুষ্টিমেয় অংশের, তা চাপিয়ে দেওয়া হয় রাষ্ট্রের জনগণের বাকি অংশের উপর। প্রতিটি স্কুলে পর্যন্ত এই অফিসিয়াল ভাষা হবে বাধ্যতামূলক আর সমস্ত

D:/Gita 2011/Jabas-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

অফিসিয়াল কাজকর্ম করা হবে অফিসিয়াল ভাষায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় নয়।

ভি. আই. লেনিন লিখেছেন, ''রাষ্ট্রব্যবস্থা হল সাংস্কৃতিক ঐক্যের সংকল্প... একটি অফিসিয়াল ভাষা হল রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান ...রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত হল কর্তৃত্বের ঐক্য, যেখানে অফিসিয়াল ভাষা সেই ঐক্যের হাতিয়ার। অফিসিয়াল ভাষা সেই একই আবশ্যিক এবং সর্বজনীন দমনমূলক শক্তি প্রয়োগ করে, যা রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্য সমস্ত রূপেরই মত...।''

এই শক্তিকে বজায় রাখার জন্য, শাসক শ্রেণীগুলো (কর্তৃত্বের ঐক্য) তৈরী করে নিপীড়ন ও অত্যাচারের একচেটিয়া এবং নিপীড়িতের উপর তা চাপিয়ে দেয় ভাষাকে একচেটিয়া করার মাধ্যমে। সমস্ত রাষ্ট্রে একটি অফিসিয়াল ভাষা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া সেই একটি ভাষার একচেটিয়ার মাধ্যমে—মতামত আদান-প্রদানের একটি মাত্র মাধ্যমের দ্বারা নিপীড়িতের দমনের আর কী ভালো উপায় থাকতে পারে!

মতামতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমরা তথ্যের জোগাড় ও সরবরাহ করে থাকি। প্রতিটি কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র হল তথ্য। **আজকের দিনে তথ্য কাজ করে দ্বিবিধ পণ্যরূপে—উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে আর চাহিদা হিসাবে।**

মতামতের আদান-প্রদান বলতে কি বোঝায়? এটা হল চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের কাজ, যেমন ভাষার মাধ্যমে কথা বলা, দেখা, ইশারা, লেখা বা আচার-ব্যবহার। শ্রমের অগ্রগতির সাথে সাথে, মানুষ তথ্যের বিনিময়ের জন্য ভাষাকেও পরিবর্তিত করে। আমরা কথা বলি, লিখি, 'চ্যাট' (ইন্টারনেটে মতামত আদান-প্রদানের একটি রূপ) করি, 'মেসেজ' পাঠাই—তা যে রূপেই হোক না কেন, আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্যের জোগান দিই; এবং মত বিনিময়কারীদের প্রয়োজনীয় কিছুর অভাব ও অপূর্ণতাও এই প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়, যা সূচিত করে চাহিদা। যখন এটা বোঝা গেল যে প্রতিদিন মতামতের আদান-প্রদানের মধ্যে বিশাল পরিমাণ অসম্ভব হারে বাড়তে থাকা তথ্য-এর অপচয় হচ্ছে যা এগিয়ে চলার পথে ফাঁকগুলোকে বোজানোর কাজে লাগতে পারে, তখন মানুষ তৈরী করল এমন ভাষা যা প্রযুক্তিকে গতি দেবে (তথ্য-প্রযুক্তি) যাতে করে এই বিশাল তথ্যসম্ভার থেকে অর্থবহ যা কিছু তা খুঁজে পাওয়া যায়। এখন এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং প্রক্রিয়া-প্রকরণের মধ্যে চালিত করা হয়। সেই অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা হয়। এই নতুন উৎপন্নগুলির তথ্য আবার সরবরাহ করা হয়। এখন ভাবুন, বিশ্বব্যাপী মতামতের আদান-প্রদান একটিমাত্র ভাষায় হলে, কত সহজ হয় তথ্যের প্রক্রিয়া-প্রকরণ এবং তার মূলধনীকরণ। বিশ্ববাজারে এটাই ভাষার একচেটিয়া তৈরীর স্বরূপ।

তথ্য-প্রযুক্তি আসলে কি? যা 'আই. টি.' বলেও পরিচিত, এটা হল কারিগরির

D:/Gita 2011/Jabas-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

এমন একটা শাখা যা যুক্ত কম্পিউটার ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে, যাতে তথ্য মজুৎ করা, তাকে খুঁজে বের করা, নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো এবং পরিসংখ্যানের পরিচালনা করা হয়, যার লক্ষ্য হল যে কোন প্রকার কথোপকথন থেকে তথ্য বের করা। তথ্য শিল্পের বাজার করায়ত্ত করার কয়েকটি পদ্ধতি এরকম :

- কৃষিক্ষেত্রে যে বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্য, সে একটা পথ দেখাচ্ছে ভারতের কৃষিসম্প্রদায়ের একটা অখণ্ড অংশ হিসাবে আই.টি.-কে যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিষ্ঠা করার।
- ব্যক্তিদের মধ্যে মত বিনিময়ের সময় তার মধ্যে থেকে যায় এক বিশাল সংখ্যার ব্যক্তি চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য। যার একটা অংশ এখন একচেটিয়ারা সংগ্রহ করে 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট'গুলি থেকে। আই.টি. কোম্পানিগুলি এখন তথ্যে রূপান্তরের পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এটা সেই তথ্যের একচেটিয়া মালিকানা যে কোন্ পণ্য আগামী দিনে উৎপাদন করতে হবে কত পরিমাণে।
- আবার উৎপন্নগুলির বিশ্ববাজার থাকা চাই। এই তথ্য যে, এখন বাজারে এই জিনিসটি পাওয়া যায়, তা পৌঁছাতে হবে যত বেশি সম্ভব খরিদ্দারের কাছে। এটা সাধারণত নানা সংবাদমাধ্যমের দ্বারা করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, তথ্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে উৎপাদনের গুরত্বপূর্ণ উপকরণগুলির একটি হিসাবে। যখন থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শ্রম বিভাজনের বশবর্তী হল, সেই সময় থেকেই তথ্যও দখলিকৃত হতে থাকল সমাজের একটি অংশের দ্বারা। এই সময়, তার দখল রয়েছে একচেটিয়া পুঁজির হাতে, উৎপাদনের, অন্য সমস্ত উপকরণের মতোই। উদাহরণস্বরূপ ঃ ভারতে ওষুধ তৈরীর জন্য তথ্য (এক্ষেত্রে ওষুধ তৈরীর জন্য অনুসংক্রান্ত সূত্র)-এর মালিকানা ভারতের একটি মাত্র কোম্পানির হাতে, বিকল্প যার কেবল বিশ্বের একচেটিয়ারা। তারা ভারতের গোটা ওষুধের বাজার ধরে রাখে এই তথ্যের মালিকানা স্বত্বের মাধ্যমে। আরও উদাহরণ হিসাবে, গবেষণাগারগুলি থেকে বিভিন্ন গবেষণার 'পেটেন্ট' কেনা হয়, যা মূলতঃ উৎপাদনের পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার 'পেটেন্ট' (প্রকৃত অর্থে তথ্য) বিক্রী হয়ে গেলে, কেবল তার ক্রেতা ছাড়া উৎপাদনে ব্যবহার করার আইনী অধিকার কারও নেই। আখেরে এর ফলে যা হয়, তা হল গোটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাই পরিচালিত হয় একটা একচেটিয়া ভাষায়।

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে তথ্য আজ নিঃসন্দেহেই একটি **দ্বিবিধ পণ্য**। যা তার প্রয়োজন, তা হল বিশ্বব্যাপী একটা ভাষা, একচেটিয়ার ভাষা। যার মধ্যে দিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে আসবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা

পূরণের জন্য বিশাল পরিমাণ তথ্য। **একটা একক ভাষা সহজতর করে তুলবে বাণিজ্য, তার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পুঁজির চলাচলকে বাড়িয়ে তুলে এবং স্বাভাবিকভাবেই মেহনতী জনগণকে নিপীড়ন করে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে একটা 'অফিসিয়াল ভাষা'।**

ভারতবর্ষে, নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও, হিন্দি ও ইংরাজী-ই অফিসিয়াল যা নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে সমস্যার মুখে ফেলে। স্কুল থেকে অফিস পর্যন্ত সর্বত্রই ইংরাজীকে করা হচ্ছে বাধ্যতামূলক। চাকরি পাওয়ার জন্য আজ শুধু 'ইংরাজী পরণ'-ই যথেষ্ট নয়, দরকার 'ইংরাজী বাচন'-ও। যে যুবরা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁদের রোজ লড়াই করতে হয় এই বিদেশী ভাষার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। এটা মানতে বাধ্য করা হচ্ছে যে এমন ভাষায় জ্ঞান না থাকলে প্রগতি সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, তবে যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁরা যাঁরা ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়েছেন,—'পরিযায়ী শ্রমিক'। শ্রমের এই অভিবাসন শ্রমিককে শিখিয়েছে নানা দেশের নানা অঞ্চলের ভাষা। এর জন্য তাদের কোন স্কুলের দরকার পড়েছে?

যখন রুশ ভাষাকে রাশিয়ায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে, যদিও দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের ভাষা ছিল 'রাশিয়ান', তখন রাশিয়ার মার্কসবাদীরা বলেছিলেন, "কোন বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল ভাষা থাকবে না, জনগণকে স্কুলের শিক্ষা দিতে হবে আঞ্চলিক ভাষায়, সংবিধানে যোগ করতে হবে একটি মৌলিক আইন যা রোধ করবে কোন একটি জাতির সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সংখ্যালঘু জাতিগুলির অধিকারভঙ্গের প্রথাকে।"

একই প্রেক্ষাপট তৈরী হয় বাংলাদেশে—২১শে ফেব্রুয়ারী, দিনটি সাক্ষ্য বহন করে ১৯৫২-র, যখন তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার একটি হিসাবে তাদের মাতৃভাষা—'বাংলা'-র স্বীকৃতির দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্ররা পুলিশের গুলিতে নিহত হন ঢাকায়, যা এখন বাংলাদেশের রাজধানী। ঘটনাটা শুরু হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, যখন তামাউদ্দীন মজলিশ (একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ঃ বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় 'বাংলা'-কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার একটি হিসাবে দাবী করে। পাকিস্তান তখন দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ভৌগলিক পার্থক্য অনুযায়ী ভাষার পার্থক্যও ছিল। ভারতের পশ্চিমের একটা অংশ যারা উর্দুতে কথা বলত আর পূর্বের অংশ যারা কথা বলত বাংলায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতীয় ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র উর্দু থাকার বিরোধিতা করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দুপুরবেলা একটি সভা হয়। নুরুল আমিন

D:/Gita 2011/Jabas-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

প্রশাসনের নিষেধ না মানার সিদ্ধান্ত করেন ছাত্ররা এবং প্রাদেশিক বিধানসভার সামনে আন্দোলনের জন্য জড়ো হন। পুলিশ কাঁদনে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ছাত্ররা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতেও। ৪টের সময়, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে পাঁচজনকে—মহম্মদ সালাউদ্দীন, আব্দুল জব্বর, আবুল বরকত্, রফিকুদ্দীন আহ্মেদ এবং আব্দুস সালাম—প্রথম তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

প্রচণ্ড দমন-পীড়নের সামনে পড়ে ঢাকায় আন্দোলনের গতি কমতে থাকে। কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জেলাগুলিতে।

৭ই মে, ১৯৫৪, পাক সরকার 'বাংলা'-কে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেয়।

২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬, নির্বাচিত বিধানসভা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে 'বাংলার' সাংবিধানিক স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে।

২৩ মার্চ, ১৯৫৬, পাক সংবিধানে তা কার্যকরী হয়।

২৬ মার্চ, ১৯৭১, বাংলাদেশ স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯, ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তা পালিত হয় প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং বহুভাষিতার জন্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে।

আজকের দিনে, যদিও বিশ্বপুঁজিবাদের এই স্তর এই দিনটিকে, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে, পর্যবসতি করেছে একান্ত আনুষ্ঠানিকতায়। দিনটির অহংকারকে করায়ত্ত করেছে অভিজাত শ্রেণীগুলি, যারা প্রায়শই বিশ্বব্যাপী একক অফিসিয়াল ভাষার পক্ষেই দাঁড়িয়ে থাকে।

ভাষা, যা জন্ম নিয়েছে মানুষের শ্রমের বৈচিত্র্যের ঐতিহাসিক গতিপথে, আজকের দিনে তার নিজস্ব বৈচিত্র হারিয়ে হয়ে উঠেছে তার স্রষ্টা—শ্রম-এরই শোষণের হাতিয়ার। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভাষার একচেটিয়ার বিষয়টি অন্য সমস্ত বাণিজ্যিক বিনিময়ের মতোই। যেমন পণ্যের বিনিময়ের বেলায় তাদের দরকার **একক ডলার মুদ্রা**, তেমনই বিশ্বপুঁজির একচেটিয়ার দরকার তথ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে **একক ভাষা মুদ্রা**। ভাষার যান্ত্রিক অভিন্নতা তাই নিপীড়নেরই এক রূপ, যা সর্বদাই দাবী রাখে, বোঝবার ও তার বিরুদ্ধে লড়বার। ভাষার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও, শ্রমিকশ্রেণীর স্লোগান আই 'জাতীয় সংস্কৃতি' নয়, বরং 'আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের সংস্কৃতি' ও 'বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন'... এবং তাই সেক্ষেত্রেও আহ্বান একটাই, **'দুনিয়ার মজদুর এক হও"**।